بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার জাতিগত ব্যাধি, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে একটি খুতবা দিয়েছিলেন। সেই খুতবায় তিনি এসব দুর্বলতার কারণ এবং এথেকে জামাতকে মুক্ত থাকার বা তা পরিহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বর্তমানেও এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এ খুতবার সাহায্য নিয়ে আজ আমি এ বিষয়টি বর্ণনা করব।

ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা বা রোগ-ব্যাধি সব সময় দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আর অপরটি হলো, জাতিগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি। অনুরূপভাবে গুণাবলীও দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, ব্যক্তিগত গুণাবলী আর অপরটি জাতিগত। ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা হলো, সেগুলো যা ব্যক্তির মাঝে থেকে থাকে কিন্তু সমষ্টিগতভাবে জাতির মাঝে তা থাকে না। অনুরূপভাবে গুণাবলীও রয়েছে। অনেক গুণাবলী ব্যক্তির মাঝে দেখা যায় কিন্তু জাতিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে জাতির মাঝে তা থাকে না। ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের মাঝে অনেক গুণাবলী সৃষ্টি করে নেয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা এবং পরিবেশ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতার কারণ হয়ে থাকে। পাপ এবং পুণ্য সম্পর্কে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পাপ ও পুণ্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুণাবলী নিজ নিজ পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি হয়। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেভাবে কোন বীজ মাটি ছাড়া অঙ্কুরিত হতে পারে না বা আজকাল আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় এক ধরনের বিশেষ মাটি প্রস্তুত করা হয় যাতে পানি ধারণ এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং সেটিকে ভালো চারায় পরিণত করার বৈশিষ্ট্য থাকে। বড় বড় পাত্রে বা গামলায় তা রাখা হয় আর বড় বড় হল ঘরে এর চাষ করা হয়। যাহোক, এটি ছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। যে কোন বীজ থেকে সঠিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বা সেটিকে অঙ্কুরিত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেটিকে মাটি বা ভূমি-সদৃশ পরিবেশ সরবরাহ করা আবশ্যক। এছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে তা শুকিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে পাপ বা পুণ্য যা কোন দুর্বলতা বা ভালো গুণের কারণে সৃষ্টি হয় তাও পরিবেশের প্রভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তাই পাপ বা পুণ্যের প্রসার ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি আবশ্যকীয় বিষয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পাপ বা পুণ্যের জন্য ভূমি বা মাটি প্রস্তুত করে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পাপ বা পুণ্য বিস্তার ঘটতে পারে না বা উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু পরিবেশও দু'ধরনের হয়ে থাকে। একই পরিবেশ সবার ওপর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা আবশ্যক নয়। এক ধরনের পরিবেশ শুধু ব্যক্তিকে প্রভাবিত করলেও জাতিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সবাইকে তা প্রভাবিত করে না বা সবার ওপর এর প্রভাব পড়ে না। এর উদাহারণ সেই ভূমির ন্যায় যাতে বিশেষ ধরনের ফসল উৎপন্ন বা উৎপাদিত হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জাফরান বা কুমকুমকে নিন যা ভারতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতের সবখানেও এটি উৎপন্ন হয় না বরং কাশ্মীর ভূকন্ডে হয়ে থাকে আর সেখানেও একটি বিশেষ অঞ্চল রয়েছে যেখানে বিশেষ ধরনের জাফরান উৎপন্ন হয় যা উন্নত মানের। পাকিস্তানী কৃষকরাও জানে বরং যারা ধান বা চালের ব্যবসা করে এমন অনেক মানুষ জানে যে, সুগন্ধিযুক্ত বাসমতি চাল বা ধান যা কালার অঞ্চলে হয়ে থাকে তা পাকিস্তানের অন্য আর কোন অঞ্চলে হয় না। কৃষি বিশেষজ্ঞরা সে ধরনের সুগন্ধি সৃষ্টির অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু সফল হতে পারে নি। যাহোক, বিশেষ ধরনের বীজের জন্য বিশেষ পরিস্থিতি আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃতির নিয়মের মাঝেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন বা নির্ধারণ করেছেন। এটি ছাড়া সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব সৃষ্টি হয় না। এরপর ভূমির প্রভাব বা ঋতুর প্রভাবও রয়েছে, এ সব কিছুই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পক্ষান্তরে কিছু ফসল এমনও আছে যেমন গম বা বিশেষ ধরনের বাগান রয়েছে যা কোন দেশের সকল স্থানেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম বা বেশি হলেও হতে পারে কিন্তু অবশ্যই উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে পাপ এবং পুণ্যও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে জাতিগত রূপ নিয়ে নেয় আর পুরো জাতির উন্নতি বা পতনের কারণ হয়ে যায়। ব্যক্তির পাপ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দূরীভূত হতে পারে। আর যদি চেষ্টা করে তবে শুধু পাপই দূরীভূত হবে না বরং ব্যক্তিগত গুণাবলীও তার মাঝে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু জাতিগত প্রভাবের ফলে যে সকল পাপ বা পুণ্য সামনে আসে সেগুলোর জন্য কোন এক ব্যক্তি বা একক ব্যক্তির চেষ্টা কার্যকরী হতে পারে না। কেননা ব্যক্তি হলো সমষ্টির অংশ। সমষ্টির মাঝে যেই ত্রুটি থাকবে তা ব্যক্তির প্রচেষ্টায় দূরীভূত হতে পারে না। কিন্তু সমষ্টির মাঝে যদি কোন ত্রুটি থাকে এরফলে ব্যক্তিও এরফলে প্রভাবিত হয়। যদি কোন অঞ্চলে পরিবেশই দূষিত হয় তাহলে সেই পরিবেশের ফলশ্রুতিতে সেখানে বসবাসকারী সবাই প্রভাবিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমরা মানব দেহের কথাই ভাবি, ধরুন কোন ব্যক্তি যদি বিষ পান করে তাহলে সেই বিষ হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করবে না তা হতে পারে না। তা পুরো দেহকে প্রভাবিত করবে। অনুরূপভাবে আমাদের খাদ্য রয়েছে। মাংস, ফলফলাদি এককথায় বিভিন্ন জিনিস আমরা খেয়ে থাকি। এগুলো থেকে দেহের প্রতিটি অঙ্গ লাভবান হয়ে থাকে। কেননা, এ সকল অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সমষ্টিই পুরো দেহ বা শরীর। তাই বিষ থেকেও তা অংশ পায় এবং ভাল খাবার

থেকেও তা লাভবান হয়। অনুরূপভাবে যেই পাপ বা পুণ্য জাতিগতভাবে সৃষ্টি হয় তা পুরো জাতিকে প্রভাবিত করে। তাই জাতিগত যেসব পাপ এবং পুণ্য রয়েছে দেহের কোন বিশেষ অংশ বা কোন ব্যক্তি এর মোকাবিলা করতে পারবে না বা কোন বিশেষ ব্যক্তির সংশোধনের ফলশ্রুতিতে জাতিগত সংশোধন হতে পারে না আর এভাবে পাপও দূরীভূত করা যায় না। আর পুণ্যের প্রসারও এভাবে সম্ভব নয়। কেননা সমষ্টির প্রভাব একক ব্যক্তির ওপর বা বিশেষ অঙ্গের ওপর অবশ্যই পরে। যাহোক, এটিই হলো রীতি, যদি সমষ্টি উপকৃত হয় তাহলে ব্যক্তিও উপকৃত হবে আর সমষ্টি যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে একক অঙ্গ বা ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই ব্যক্তির পাপ বা গুনাহ্‌কে চিহ্নিত করে চিকিৎসার মাধ্যমে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর কারো মাঝে যদি ব্যক্তিগতভাবে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তাহলে সে নিজেও চেষ্টা করে নিজের পাপ দূর করতে পারে। কিন্তু জাতিগত ব্যাধি বা পাপ দূরীভূত করার জন্য পুরো জাতিকে ভাবতে হয়। জাতিগতভাবে যদি পাপ দূরীভূত করার জন্য সোচ্চার না হয়, চেষ্টা না করে বা জাতিগতভাবে যদি চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে জাতিগতভাবে সেই পাপ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় আর একটি সময় এমন আসে যখন তা জাতির ধ্বংস ডেকে আনে।

তাই যেখানে আমাদের সবার নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক সেখানে জাতিগতভাবেও আমাদের দুর্বলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর সেগুলোকে চিহ্নিত করে জাতিগতভাবে এর চিকিৎসা এবং সুরাহা করা উচিত। আর এই সুরাহা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমষ্টিগত বা সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে এবং সম্মিলিত চিকিৎসা ছাড়া আমরা কখনো সফল হতে পারব না। জাগতিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করলেও আপনারা দেখবেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যেমন, বন্যার সময় কোন কৃষক বাঁধ দিয়ে নিজের জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। বাঁধ দেয়া বা এর জন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া সরকারের কাজ। সম্মিলিত উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয়ে থাকে। ব্যক্তির সমষ্টির নাম হলো সরকার। আর যেখানে সরকারই অকর্মণ্য সেখানে পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেভাবে পাকিস্তানে সম্প্রতি গরমের সময় যে বন্যা এসেছে সেই বন্যার সময়ও আমরা দেখেছি। আর সবসময় এটি আমরা লক্ষ্য করে থাকি। কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব। নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমন যে, যখন তা আসে তখন এড়ানো কঠিন কিন্তু কিছু দুর্যোগ এমনও আছে যার ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে। কোন কোন দুর্যোগ দেখা দেয়ার পূর্বেই সেগুলোর পূর্বাভাষ দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু মানুষ নিজ ঔদাসীন্যের কারণে মনোযোগ দেয় না এবং এরফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাহোক, সরকার বা জাতির মাঝে যদি দায়িত্ববোধের চেতনা না থাকে তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায় আর এটি আমরা অহরহ পৃথিবীতে লক্ষ্য করি।

তাই সংশোধনের জন্য জাতিগত সচেতনতা আবশ্যক। আহমদীয়া জামাতের প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই জাতিগত ব্যাধির প্রতি কীভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত আর কীভাবে বিষয়টি ভাবা উচিত সে সম্পর্কে বলেন, জামাত যদি কতিপয় দৃষ্টিকোন থেকে এগুলো সম্পর্কে প্রণিধান এবং এর চিকিৎসা করে তাহলে লাভবান হতে পারে। এর বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। কেননা, এই মাধ্যমগুলো জাতিগত ব্যাধি নির্ণয় করতে পারে। আর এগুলো যদি শনাক্ত হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসাও সম্ভব। প্রথম মাধ্যম হলো, সেসব শিক্ষামালা যা কোন জাতিতে প্রচলিত থাকে বা বিদ্যমান থাকে এবং যা মেনে চলা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য আবশ্যক মনে করে। আর সেগুলো যদি ক্ষতিকর বিষয় হয়ে থাকে বা এ শিক্ষার যদি ক্ষতিকর ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে যেভাবে কতিপয় ধর্মে দেখা যায় তাহলে সে শিক্ষার ফলে তাদের মাঝে পাপের জন্ম হয় এবং বিদআত মাথা চাড়া দেয় বা বিদআতের কারণে পাপের উন্মেষ ঘটে। যদি কোন ধর্মে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কুপ্রথা থাকে তাহলে সে ধর্মের অনুসারী প্রত্যেক ব্যক্তি এতে প্রভাবিত হবে। আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এটি ক্ষতিকর ফলাফল সৃষ্টি হবে। শুধু ধর্মীয় জীবনেই নয় বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এর কুফল প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান, কুরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বা আল্লাহ্ তা'লার উক্তি মনে করি আর এ কথায় বিশ্বাস রাখি যে, এই শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই এবং এর কোন ক্ষতিকর দিক সামনে আসতেই পারে না বা এর ফলে কোন প্রকার পাপের জন্ম হওয়া অসম্ভব। শিক্ষা যেহেতু ত্রুটিমুক্ত তাই অশুভ ফলাফল প্রকাশ পেতেই পারে না।

তাই মুসলমানরা ধরে নিয়েছে, তাদের মাঝে এখন পাপ সৃষ্টিই হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো সকল মুসলমান কি পাপ মুক্ত? আমরা যদি আমাদের পরিবেশের ওপর দৃষ্টিপাত করি, মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা লক্ষ্য করি, তাহলে বোঝা যায়, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই পাপে নিমজ্জিত। তাই আমাদের এটি নিয়ে ভাবা উচিত, কুরআনে কোন ত্রুটি নেই। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআনে ঘোষণা করেছেন, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা নেই। এটি কামেল এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত। যদি কুরআন শরীফের অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও কথা পূর্ণ হয়ে থাকে আর আমরা দেখছি যে, তা পুর্ণ হচ্ছে তাহলে খোদার এই ঘোষণাও অবশ্যই সত্য যে, কুরআনী শিক্ষা সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে এবং এর শিক্ষা কামেল ও সম্পূর্ণ। তাই আমরা এ ঘোষণাকে অবশ্যই সত্য মনে করি । এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে সমস্যা বা ঘাটতি কোথায়? এর উত্তর এটিই হওয়া উচিত যে, এটি বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। এটি মেনে চলার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে। অতএব, কুরআনে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা না থাকে তাহলে নিশ্চয় আমাদের অনুধাবনে এবং আমাদের আমল বা কর্মে কোন ভ্রান্তি রয়েছে। আর অবশ্যই কুরআনে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা নেই, কোন ঘাটতি নেই। আর এই বোঝার ভুলের কারণেই জাতি ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হয়েছে। এসব ভুল-ভ্রান্তি জাতির পুরনো আলেমদের কুরআনি শিক্ষাকে ভুল বোঝার কারণেও হতে

পারে বা বর্তমান আলেমদের ভুল বোঝার কারণেও হতে পারে। যাহোক, ফলাফল আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট। আলেম বা মুফাস্সেররা নিঃসন্দেহে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি রাখত বা রাখে আর এগুলো তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত আইডিয়োলজি কিন্তু জাতি একথা বলে না যে, এটি আলেমদের ব্যক্তিগত অভিমত বরং জাতি সেইসব আলেমদের দিকে চেয়ে থাকে। তাই তাদের অনুকরণকারীরা ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বা কুরআনের তফসীর না বোঝার কারণে শিক্ষা উন্নত হওয়া সত্ত্বেও লাভবান হতে পারেনি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এ কারণে জাতির মাঝে বিভিন্ন পাপ মাথা চাড়া দিয়েছে। কিছু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে যার সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়েছে, অন্যান্য ধর্মের প্রভাব পড়েছে, বিভিন্ন সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে যাকে ভুলবশতঃ ধর্মের অংশ জ্ঞান করা হয়েছে। যাহোক, দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি বা রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে। এটি খোদার অপার অনুগ্রহ যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত আর এসকল পুরনো হাদীস বা রেওয়ায়েত অথবা প্রজ্ঞাহীন হাদীস বা রেওয়ায়েত বা তফসীরের আমাদের ওপর কোন প্রভাব পড়তে পারে না আর পড়া উচিতও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা একশত ভাগ নিরাপদ নই কেননা বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষ আমাদের জামাতভুক্ত হয়। যারা অনেক সময় অনেক বিষয়ে সন্দেহের শিকার হয় বা মনে করে যে, এ বিষয়টি যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর অনেক সময় অনেক নবাগত আলেম নিজেদের ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে তফসীর করে বসে। যদিও তফসীর করা নিষিদ্ধ নয়, তফসীর হওয়া উচিত কিন্তু তফসীর করারও কিছু নীতি আছে। যাহোক, এই ভুলের কারণে আরো একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটতে পারে। তাই এই বিপত্তিকে এড়ানোর জন্য আলেমদেরও খিলাফত এবং জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনেই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা উচিত। যাহোক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সামগ্রীকভাবে আমরা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত। কিন্তু নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে আর এর রীতি হলো, অ-আহমদীরা যে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছে সর্বদা তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; কেবল তবেই আমরা এসব ভুল-ভ্রান্তি যাতে আমাদের মাঝে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে পারব আর জাতিগত দুর্বলতা এড়াতে সক্ষম হবো। এছাড়া এই বিষয়েও আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমাদের চতুষ্পার্শের পরিবেশে যে সমস্ত ধর্মাবলী রয়েছে বা যে ধরনের মানুষই বসবাস করুক না কেন, ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক হোক বা না হোক, কোন ধর্মে তাদের বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, তারা আস্তিক হোক বা নাস্তিক, আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তাদের মাঝে কোন কোন জাতিগত দুর্বলতা রয়েছে। এই কাজের গন্ডিকে পার্শ্ববর্তী দেশের জাতিগত যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলো পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা উচিত বরং পৃথিবী এখন এত ছোট হয়ে গেছে যে, সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ পরস্পরের প্রতিবেশীর মত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন দূরত্ব বলতে আর কিছু নেই আর তাছাড়া প্রচার মাধ্যমও

সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা তাদের গুণাবলী স্পষ্টভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে আর প্রতিবেশী দেশের প্রভাবও পার্শ্ববর্তী দেশের ওপর পড়ে থাকে। বাচ্চারা যে পরিবেশে জীবন যাপন করে সেই পরিবেশ বা প্রতিবেশীদের প্রভাব বাচ্চাদের ওপরও পড়ে। পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততিদের শেখানো সত্ত্বেও পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। এছাড়া ছেলে-মেয়েরা বেশীর ভাগ সময় স্কুলে বা অন্যান্য বন্ধুদের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে বা আজকের যুগে ঘরেই এমনসব বন্ধু পাওয়া যায় যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করেছে, যা ছোট-বড় সবার ওপর সমানভাবে প্রভাব ফেলছে এরফলে ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার কথা শুনতে চায় না। আর পিতা-মাতারাও নিজেদের ব্যস্ততার কারণে বা অন্য কোন কারণে ছেলে-মেয়েদের সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। আর অনেকে এমনও আছেন যারা ঘরে স্বয়ং এগুলোর মাধ্যমে অর্থাৎ টেলিভেশন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশকে কলুষিত করছেন। আর এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা প্রকাশ পায় এবং পাচ্ছে তাহলো, পিতা-মাতারা সন্তানদের ওপর যুলুম বা অত্যাচার আরম্ভ করে আর ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার সম্মান করে না। আর বলে দেয়, এই পরিবেশে আমাদেরকে এভাবেই থাকতে হবে। এখানে যদি এসে থাক তাহলে এভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। আর এগুলো তখন আর ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকে না বরং তা জাতিগত দুর্বলতা এবং পাপে পর্যবসিত হয়। ঘর ধ্বংস হচ্ছে। পিতা-মাতা সন্তান সন্ততিকে আধ্যাত্মিকভাবেও হত্যা করছে আর দৈহিক ভাবেও। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থা এমনিতেই স্বাধীনতার নামে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, আর এটি হচ্ছে জাতিগত পাপ, কিন্তু কতক আহমদীও এর গ্রাসে পরিণত হচ্ছে। এটি জাতিগত পাপে পর্যবসিত হয়ে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার পর পুনরায় আমাদের অজ্ঞতায় ফিরে যাওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জাতিগতভাবে এ সকল পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করা প্রয়োজন। তাই জামাতে আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার সকল বিভাগ এই বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে বসুন এবং পরিকল্পনা হাতে নিন আর যদি কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে এখন থেকেই সেটি নির্মূল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা না করুন, পাছে জাতি হিসেবে বা জাতিগত পর্যায়ে পাশ্চাত্যের রোগ-ব্যাধি আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে না বসে। আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছি। আমরা এ অঙ্গীকার করেছি, এ ঘোষণা দিয়েছি, আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসা করবো বা সংশোধন করবো। চিকিৎসকরাই যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত রোগ-ব্যাধি কে দূর করবে? আর একথাটিও সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত, কোন জাতিতে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থার কারণে কিছু পুণ্যের বা নেকীরও জন্ম হতে পারে আর কিছু দুর্বলতাও মাথাচাড়া দিতে পারে। এর দৃষ্টান্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে দিয়েছেন, আমাদের জামাত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সর্বত্র প্রসার লাভ করেছে আর আল্লাহ্ তা'লা দূর-দূরান্তের মানুষের মন জয় করছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত ব্যাপক

প্রসারতা লাভ করেছে। একইসাথে আমাদের জামাতের এটিও বিশ্বাস, কখনো অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয়। কেননা গয়ের আহমদী ইমাম সেই ইমামকে মান্য করেনি যাকে আল্লাহ্ তা'লা যুগ ইমাম হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর শুধু অস্বীকারই করেনি বরং তারা চরম নোংরা ভাষা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

অতএব, আমরা খোদার মনোনীত ইমামের ওপর মানুষের নিযুক্ত ইমামকে প্রাধাণ্য দিতে পারি না। তাই আমরা তাদের পিছনে নামায পড়ি না। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সবখানেই জামাতের কেন্দ্র রয়েছে আর মসজিদও রয়েছে, যেখানে আহমদীরা বা-জামাত নামায পড়তে পারে বা পড়ে। কিন্তু কিছু অঞ্চল এখন পর্যন্ত এমনও আছে যেখানে দু-একটি আহমদী পরিবার বসবাস করেন। তাই তারা নিজেদের ঘরেই নামায পড়েন। সম্মিলিতভাবে বা জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়ার পরিবর্তে সবাই ব্যক্তিগতভাবে নামায পড়ে থাকে। এদিকে আমি পূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, ঘরেও যদি বা-জামাত নামায পড়ে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। বা অনেকে ব্যস্ততার অজুহাতে পৃথকভাবে নামায পড়ে নেয়। অনেকে কাজের ব্যস্ততার কারণে নামায জমা করে পড়ে। এই কারণগুলোর জন্য দায়ী হলো, মসজিদে যাওয়ার প্রতি মনোযোগ নেই বা কতিপয় জায়গায় কাছাকাছি মসজিদও নেই আর পাশে যে গয়ের আহমদী মসজিদ আছে সেই মসজিদে আমাদের যাওয়ারও অনুমতি নেই বা আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। যার ফলে নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু ঘরে পড়ে আর বাজামাত নামাযের প্রতি মোটের ওপর মনোযোগ নেই বা অযথা নামায জমা করার প্রতি আকর্ষণ বা প্রবণতা বেড়ে গেছে। বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এবং বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও একটা বিরাট শ্রেণীর মাঝে বাজামাত নামায পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যায় না। এটি যেন এক জাতিগত ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। তাই এর যথাযথ চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এটি কোন ব্যক্তিগত ব্যাধি নয় যে, অমুক ব্যক্তি মসজিদে নামায পড়তে আসেনি। যেভাবে মনোযোগ হীনতা বা মনোযোগ শূন্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এর ফলে এখন এটি জাতিগত ব্যাধি এবং দুর্বলতায় পর্যবসিত হচ্ছে। পরিস্থিতির কারণে বা সুযোগ সুবিধা বাজামাত নামাযের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আহমদীরা ঘরে নামায পড়ে। আর তাদের মাঝে অনেকেই এমনও আছে যারা অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে, আকুতি-মিনতির সাথে নামায পড়ে থাকে। যেখানে অন্যান্য মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হয়ত এমন মনোযোগের সঙ্গে নামায পড়ে না কিন্তু তা সত্ত্বেও বাহ্যিকতার খাতিরে হলেও যারা নামায পড়ে তারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে থাকে। আর এখন তো পাকিস্তান থেকেও এই সংবাদ আসে যে, গয়ের আহমদীদের ভেতর মসজিদে যাওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে একথা জানা নেই যে, তারা মনোযোগ সহকারে নামায পড়ে কি না কিন্তু মসজিদে অবশ্যই যায় আর সেখানে আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত এবং আজেবাজে কথাও তারা শুনে থাকে। আর এ কারণে তাদের হৃদয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণাও দানা বাঁধছে। পাপ তো অবশ্যই তাদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু এ

বিষয়টি সত্য যে, তারা মসজিদে যায়। আমরা যদি মসজিদে যাই তাহলে পাপ দূরীভূত করার জন্য গিয়ে থাকি তাই আমাদের মসজিদে যাওয়া আর তাদের মসজিদে যাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু তাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমাদের এ ক্ষেত্রে এখনও অনেক ঘাটতি আছে।

তাই আমাদের এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। সত্যিকার অর্থে মু'মিনরাই মসজিদ আবাদ করে থাকে। আর সত্যিকার মু'মিন হলো তারাই যারা যুগ ইমামকে মেনেছে। তারা নয় যারা ইবাতের নামে ফিৎনা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। জাতিগতভাবে মসজিদে গিয়ে নামায না পড়া বা নামায জমা করার ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা এবং সম্ভাবনা তখন বেড়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে নামাযের গুরুত্ব ক্রমশঃ লোপ যাচ্ছে আর অনেক ছেলেমেয়ে পিতা-মাতার অবস্থা দেখে একথাও বলা আরম্ভ করেছে যে, প্রতিদিন তিন বেলা নামায হয়ে থাকে। যখন বলা হয়, পাঁচবেলা নামায পড়তে হয় তখন তারা বলে, আমরা কিন্তু আমাদের পিতা-মাতাকে তিন বেলাই নামায পড়তে দেখেছি। তাই সর্বত্র এ সম্পর্কে মনোযোগ দেয়া এবং পরিকল্পনা করা প্রয়োজন নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে এটি জাতিগত ব্যাধির আকারে দেখা দিবে। নিজেদের পরিবেশের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে, আমাদেরকে ব্যাপকতর পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

আজকে পৃথিবীর অবস্থা হলো, মানুষ খোদা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি পুরো সচেতনতার সাথে চেষ্টা না করি বা পদক্ষেপ না নেই তাহলে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করা শুরু করবে। এক ব্যাধির পর দ্বিতীয় ব্যাধি দেখা দিবে। ধর্মের শুধু নামই থেকে যাবে, তাতে সত্যিকার প্রাণ আর থাকবে না। কোন অঞ্চলে যদি কোন মহামারী দেখা দেয় বা কোন রোগ দেখা দেয় তাহলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি আর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে থাকি তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিক রোগের আশংকা দূরীভূত করার জন্য আমাদের কতটা সচেতন হওয়া উচিত। এই সমাজে বসবাস করে বরং আমি যেমনটি বলেছি, এখন তো সারা পৃথিবী প্রায় একটি দেশে পরিণত হয়েছে আর পাপ এবং অপকর্মের সংক্রামক ব্যাধি দূরীভূত করার জন্য এমন পরিস্থিতিতে আরো বেশি সচেতনতার সাথে চেষ্টা করা উচিত। যারা আত্মরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, চিকিৎসা করিয়ে থাকে, আত্মরক্ষার নিমিত্তে টিকা নিয়ে থাকে তারা অন্যদের তুলনায় বাহ্যিক রোগ-ব্যাধি থেকে বেশি নিরাপদ থাকে।

তাই আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি যেভাবে বলেছি সকল পর্যায়ে জাতিগত চেতনা নিয়ে আত্মরক্ষামূলক পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কর্মের বিকৃতির কারণে যা আলেমরা উম্মতের মাঝে সৃষ্টি করে রেখেছে আজ মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ শিক্ষা উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও ভ্রষ্টতায় নিপতিত। এখন আমাদেরকে নিজেদের সংশোধনের পর স্থায়ীভাবে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। আমাদের প্রণিধান করা উচিত, অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে কোন্

কোনা ক্ষেত্রে রোগ-ব্যাধি দেখা দিয়েছে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে আর আমরা কীভাবে সেগুলো থেকে রক্ষা পেতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণের পর তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এর ওপর আমল করাও একান্ত আবশ্যক। পরিবর্তিত সামাজিক অবক্ষয়ের স্রোতে নিজেদের গা ভাসিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং আমাদের কাজ হলো অবস্থাকে নিজেদের শিক্ষাসম্মত করা।

খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা আবশ্যক। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ এবং জামাতের ওয়েব সাইটও দান করেছেন। আজেবাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকাও একান্ত আবশ্যক। কেননা এর মাধ্যমে সত্যিকার কুরআনী শিক্ষা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। এগুলোর মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা আমাদের লাভ হয়। তাই আমাদের এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক। আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, মুসলমানরা কুরআনের মত গ্রন্থ পেয়েছে, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মাঝে এমনসব ভুল-ভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে যারফলে বিশেষ রোগ দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই যে বিষয়টি তাদের মাঝে জাতিগত ব্যাধি সৃষ্টি করার সবচেয়ে বড় কারণ প্রমাণিত হয়েছে তাহলো, মুসলমানদের এই দৃঢ় বিশ্বাস, কুরআন শরীফ একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং এতে সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি মানুষের জন্য হিদায়াতের কারণ।

অতএব, বাহ্যত এ কথাগুলো শুনে এটিই মনে হয়, এই কারণে কুরআনের যে সৌন্দর্য্য এবং বৈশিষ্ট্য একে একপ্রকার ত্রুটি বা দুর্বলতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে কেননা কুরআন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এগুলো আসলে কুরআনের সৌন্দর্য্যই কিন্তু এটিকে ভুল বোঝার কারণে অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষাকে ভুল বোঝার কারণে মুসলমানদের মাঝে অনেক বড় ব্যাধি দেখা দিয়েছে। এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন করীম একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এটি কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল যুগের জন্য হিদায়াত বা হিদায়াতনামা যাতে সকল প্রকার উৎকর্ষপূর্ণ শিক্ষার সমাহার ঘটেছে। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি মানব মস্তিষ্কের স্রষ্টা তিনি একথাও জানতেন, মানব মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য হলো, যদি এর মাঝে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস সৃষ্টি না করা হয় তাহলে এটি মরে যায় এবং উন্নতি করার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। তাই যদিও তিনি কুরআনকে কামেল এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে নাযিল করেছেন কিন্তু প্রত্যেক আদেশ যা তিনি দিয়েছেন তার একটা অংশ মানব মস্তিষ্কের চিন্তা-ভাবনার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। কিছু নীতি এমন নির্ধারণ করেছেন যা সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য আর কিছু এমন কথা বা বিষয় রয়েছে যা সম্পর্কে ভাবা এবং প্রণিধান করা আবশ্যক যেন মানুষ নিজে সন্ধান করতে পারে, তার মন-মস্তিষ্ক যেন অকেজো না হয়ে যায়। তাই পবিত্র কুরআন এমন ভাষায় বা এমন

বাক্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, এগুলো সম্পর্কে ভাবলে বা প্রণিধান করলে এর তত্ত্বজ্ঞান এবং গভীরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। নতুবা সবাইকে একইভাবে উপকৃত করা যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে কুরআন শরীফে বর্ণিত বিষয় হতো প্রকাশ্য বা সুস্পষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তি তা সে চিন্তা করুক বা না করুক এসব বিষয় সম্পর্কে সে অবহিত হতো। তাই ঐশী অভিপ্রায় এটিই যে, মানুষের মন-মস্তিষ্ক যেন অকেজো না হয়ে যায় এবং চিন্তা বা প্রণিধান না করার কারণে কোথাও এর উন্নতি এবং বিকাশের ধারা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত, এরও কিছু নীতি নির্ধারিত আছে যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। আর এ যুগে সেগুলোর প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে বিভিন্ন নীতি তুলে ধরেছেন। স্পষ্টভাবে তফসীর করে তিনি আমাদের তা দেখিয়েছেন ও বুঝিয়েছেন যা আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং এগুলোর সাহায্যে কুরআন শরীফে নিত্য নতুন নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তথ্য যারা সন্ধান করতে চায় তাদের সন্ধান করা উচিত। অন্যান্য মুসলমানের মতো আমরা যদি শুধু পুরনো তফসীর নিয়েই পড়ে থাকি তাহলে সেসব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হবে না যার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পথের দিশা দিয়েছেন। আজকাল অ-আহমদীদের মধ্যেও যারা বড় বড় মুফাস্সের, ডক্টর এবং আলেম রয়েছে তারাও আমাদের জামাতের বই-পুস্তক এবং তফসীর পড়ে নিজেদের দরস দেয়। বরং কিছু আলেম এমনও আছে যারা রীতিমত তফসীরে কবীর পাঠ করে। তাই অবশ্যই কুরআন শরীফ একটি কামেল এবং উৎকর্ষপূর্ণ আর সম্পূর্ণ গ্রন্থ আর এতে কোন সন্দেহ নেই, এর মাঝে সব কিছুই রয়েছে কিন্তু এটি পড়ার পর যারা চিন্তা-ভাবনা করে আর এর শিক্ষা মোতাবেক অনুশীলন করে তারাই হিদায়াত পায়। শুধুমাত্র একটি কথা শিখে মনে করা যে, হিদায়াত পেয়ে গেছি এটি যথেষ্ট নয় বরং প্রতিটি শিক্ষার ওপর আমল করা জরুরী। এর মাধ্যমেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দোষ এবং গুণের কথা জানা যায়।

এই গ্রন্থে আখারীনদের শিক্ষার জন্য এবং তাদের চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য, আলো দেখানোর জন্য এবং পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় এক রসূল প্রেরণের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যারা ভাবে না বা প্রণিধান করে না এবং আলেম আখ্যায়িত হয়েও যারা অজ্ঞ আর খোদার প্রেরিতকে যারা অস্বীকার করে, এই কারণে তারা কুরআনের জ্ঞানের ব্যাপকতা থেকে বঞ্চিত আর অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরার পরিবর্তে ইসলামের দুর্নাম করার কারণ হচ্ছে। অতএব, এই সকল মুসলমানের এমন কর্ম আমাদেরকে যেন এ সম্পর্কে আরো বেশি ভাবতে এবং প্রণিধান করতে শিখায়, আমরা যেন শুধু বাহ্যিকতাকেই সবকিছু মনে না করি বরং ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত প্রাণকে বুঝে সকল প্রকার পাপকে জাতিগত পাপে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই যেন দূর করতে পারি আর সকল প্রকার পুণ্যকে জাতিগত পুণ্যে রূপান্তরিত করে পুরো জামাতে যেন তা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সবসময় আমরা যেন এমন পরিবেশ উপহার দিতে পারি আর এই শিক্ষাকে যেন পরবর্তী প্রজন্মে

সঞ্চালন করতে পারি যার কল্যাণে পাপের বিস্তার ঘটার পরিবর্তে নেকী এবং পুণ্যের বিস্তার ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

আজ নামাযের পর আমি দু'জনের হাযের জানাজা পড়াব এবং দু'টি গায়েবানা জানাযাও হবে।

হাযের জানাযার মধ্য থেকে একটি হলো মোহতরমা রাজিয়া মুসার্‌রাত খান সাহেবার যিনি হন্সলোর সেক্রেটারী রিস্তানাতা জনাব আব্দুল লতীফ খান সাহেবের স্ত্রী। গত ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ৭৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মুহাম্মদ যহুর খান সাহেবের পুত্রবধূ এবং সুবেদার করম বখশ সাহেবের কন্যা ছিলেন। ১৯৬২ সনে ইংল্যান্ডে স্থানান্তরিত হন। ১৯৭৫ সালে দু'বছর হন্সলোর লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং এরপর দীর্ঘকাল হন্সলোতে লাজনার সেক্রেটারি যিয়াফত হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। অতিথি ছাড়াও জামাতী অনুষ্ঠানের সময় নিজ টীম নিয়ে বড় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অতিথি সেবা করতেন। হন্সলোতে আহমদী ছেলে-মেয়েদের ছাড়াও অ-আহমদীদের ছেলে মেয়েদেরও কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী, মিশুক, অতিথি পরায়ণ, মুখলেস ও পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। সন্তানদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন। তার সন্তানরা কোন না কোনভাবে জামাতের সেবা করার তৌফিক লাভ করছে। স্বামী ছাড়াও তিনি দুই মেয়ে এবং চারজন ছেলে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার পুত্র জহির খান সাহেব হন্সলো জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং গত কয়েক বছর ধরে সহকারী অফিসার জলসাগাহ্ হিসেবে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদ মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা স্নেহের আমের সিরাজ সাহেবের যিনি দক্ষিণ মর্ডেনের শাহেদ মাহমুদ সাহেবের পুত্র। তিনি গত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ২৯ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিস্ত্রী হাসান দ্বীন সাহেব (রা.) মরহুমের বড় দাদা এবং হেকীম জালাল উদ্দীন সাহেব (রা.) তার পিতার বড় নানা ছিলেন। নিজের জামাতের খিদমত ছাড়াও বড় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জলসা সালানায় নিরাপত্তার ডিউটি করতেন। সচ্চরিত্রবান, মিশুক এবং নিষ্ঠাবান যুবক ছিলেন। পিতা-মাতা ছাড়াও স্ত্রী এবং আড়াই বছর বয়স্কা মেয়ে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। মরহুম ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি হাসি মুখে এই কষ্টদায়ক রোগের মোকাবিলা করেছেন। রোগের ভয়াবহ প্রকোপের সময়ও আমার কাছে এসেছেন। যখনই আসতেন মুখে হাসি লেগে থাকত। বড় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক যুবক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মাগফিরাত করুন। স্বীয় রহমতের চাঁদরে তাকে আবৃত করুন। তার স্ত্রী এবং সন্তানকেও স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং ধৈর্য্য দান করুন। তার পিতা-মাতাকেও ধৈর্য্য এবং মনোবল দিন।

গায়েবানা জানাযায় প্রথমে রয়েছেন জনাব আলহাজ্জ রশীদ আহমদ সাহেব। যিনি আমেরিকার মালওয়াকিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৯১ বছর। মরহুম ১৯২৩ সনে আমেরিকার সেইন্ট লুইস শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সনে বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা ইসলাম গ্রহণ করেন। বয়আতের দুই বছর পর ১৯৪৯ সনে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য রাবওয়া গমন করেন। সেখানে স্বয়ং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রেলস্টেশনে গিয়ে তাকে স্বাগত জানান। তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেছেন। এরপর রীতিমত মুবাল্লিগ নিযুক্ত হন। পাকিস্তানে অবস্থানকালে উর্দূ এবং পাঞ্জাবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। আমেরিকা থেকে সর্বপ্রথম জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার সম্মান তিনিই লাভ করেন। এভাবে রাবওয়ায় পাঁচ বছর অবস্থানকালে তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বিশেষ সাহচর্য লাভ করেন। হুযূর (রা.) জামাতের মুবাল্লিগ হাজী ইবরাহীম খলীল সাহেবের কন্যা সাহেবযাদী মোকাররমা সারাহ্ কুদসিয়া সাহেবার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন যার ঔরসে তার তিনটি সন্তান হয়। এক ছেলে আগেই ইন্তেকাল করেছেন। তার প্রথম ঘরের এক ছেলে এবং এক মেয়ে জীবিত আছে। তারা আমেরিকায় বসবাস করে। ১৯৫৫ সালে জামেয়া আহমদীয়ার পড়াশুনা সম্পন্ন করার পর তাকে আমেরিকায় মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠানো হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রাবওয়া থেকে তার যাত্রার সময় নিজ পবিত্র হাতে লিখে তাকে নসীহত করেন আর পাগড়ীর একটি কুলাহ্ যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাপড়ের একটি টুকরো সেলাই করা ছিল তাকে উপহার দেন যা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার কাছে সুরক্ষিত ছিল। এখন তার সন্তানদের কাছে তা রয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আমেরিকার সর্বপ্রথম স্থানীয় মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি আমেরিকায় শিকাগো, সেইন্ট লুইস এবং অন্যান্য শহরে অবৈতনিক মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করা ছাড়াও আমেরিকার আমীর হিসেবেও কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন মালাওয়াকি জামাতের প্রেসিডেন্ট ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পদে জামাতের খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন সেইন্ট লুইসের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব খালেদ উসমান সাহেবের কন্যা আযিযা আহমদ সাহেবাকে যার ঔরসে তার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। তার তবলীগের উৎসাহ উদ্দীপনা উম্মাদনার পর্যায়ে উপনীত ছিল। তবলীগের কোন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না। মালাওয়াকি জামাতের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি সেখানে স্থানীয় আমেরিকান আহমদীদের একটি বড় জামাতের ভীত রচনা করেন যা আমেরিকার অন্যান্য জামাতের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৯৮ সনে তিনি হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। মালাওয়াকিতে আহমদীরা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকদের কাছেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। বিশ বছর যাবত টেলিভিশনে ইসলাম লাইভ নামক একটি অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অনুষ্টান করতেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের সাপ্তাহিক তবলীগি স্টলে

রীতিমত যাওয়া অব্যাহত রাখেন। মৃত্যুর পূর্বে যতক্ষণ তিনি সুস্থ ছিলেন নার্স ও সেবিকাদের তবলীগ করা অব্যাহত রাখেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে শহরের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় "ইউনিভার্সিটি অফ স্কান্সন"-এ সাধারণ মুসলমানদের জন্য একটি বড় জলসার আয়োজন করেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। রীতিমত ক্যাম্পাসে বক্তৃতা দিতেন। হাজার হাজার ছাত্রকে ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। মরহুম অনেক স্থানীয় এবং জাতীয় নেতার সাথেও রীতিমত যোগাযোগ রাখতেন। রোববার সাধারণ লোকদের জন্য মিটিং ডাকতেন যাতে আহমদী বন্ধুরা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকেরা আসত এবং তার কথা থেকে উপকৃত হতো। বন্ধুদের অনুরোধে এবং কেন্দ্রের অনুমতি স্বাপেক্ষে তিনি তার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন যাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বিশেষ সাহচর্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সফরে যাওয়া, প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে অংশগ্রহণ করা এবং রীতিমত নোটবুকে বিভিন্ন কথা নোট করার উল্লেখ রয়েছে। আর এটিকে পুস্তক আকারে প্রকাশের জন্য বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রমের পর তা প্রস্তুত হয় আর এখন কেন্দ্রের অনুমতি স্বাপেক্ষে তা ছাপতে যাচ্ছে।

জামাতের মুরুব্বী মালেক ফারান রব্বানী সাহেব লিখেন, নয় মাস পূর্বে এখানে মুবাল্লিগ হিসেবে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। আমার বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি গভীর ভালবাসার সাথে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর আমি যখন মালাওয়াকি জামাতে কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে তার সাথে পরামর্শ করতে চাইলাম তখন তিনি উর্দূতে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, মৌলানা সাহেব! আপনি খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি, আপনি যা বলবেন আমাদের কাজ হলো তার পূর্ণ আনুগত্য করা। তার মাঝে আনুগত্যের গভীর চেতনা এবং প্রেরণা ছিল। শামশাদ সাহেবও লিখেন, আমেরিকায় আসার পর থেকে আমি তাকে সবসময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কথা শুনাতে দেখেছি। তিনি নিজের জীবনকেও হযরত মুসলেহ্ মওউদের নির্দেশ অনুযায়ী সাজিয়ে রেখেছিলেন। গত জলসা সালানায় তার বক্তৃতার বিষয়ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর স্মৃতি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ থেকে কি শিক্ষা নিবে সেই সংক্রান্ত ছিল। এটি বলা অসঙ্গত হবে না যে, তিনি সর্বদা ইসলাম আহমদীয়াত এবং খিলাফতের সুরক্ষার জন্য নগ্ন তরবারী স্বরূপ ছিলেন। তিনি সবসময় আহমদীয়াতের তবলীগে নিয়োজিত থাকতেন। বৃদ্ধ বয়সেও যখন শরীর খুবই দুর্বল এবং ক্ষীণ ছিল তিনি একাই তবলীগের জন্য বের হতেন এবং মিষ্টার তবলীগ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে এক বিশাল জনগোষ্ঠী তার জানাযায় উপস্থিত ছিল।

পরবর্তিটিও গায়েবানা জানাযা। ডেট্রয়েটের হাসান আব্দুল্লাহ্ সাহেবের। তিনিও আমেরিকান আহমদী। ২০১৫ সনের ৩০ জানুয়ারী, তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯২৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এক খ্রিষ্টান পরিবারে তার জন্ম হয়। জন্মের পর তার নাম রাখা হয়

উইলিয়াম হেনরী। ১৯৭০-এর দশকে একজন আহমদী ব্রাদার জনাব ওয়াহাব সাহেব, যিনি তার সহপাঠী ছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় হাসান আব্দুল্লাহ্। অনেক গুণাবলীর অধিকারী এক নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। কুরআনের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। প্রতিদিন তিলাওয়াত করা ছিল তার রীতি। তিনি বলতেন, তিনি সূরা কাহাফের প্রথম এবং শেষ দশটি আয়াত সবসময় তিলাওয়াত করেন। রীতিমত জুমুআর নামায পড়তেন। সর্বপ্রথম মসজিদে এসে সুললিত কণ্ঠে আযান দিতেন। নামাযে জুমুআর জন্য নামাযের অনেক পূর্বে এসে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং নফল পড়তেন। সুন্দর পরিপাটি পোষাক পরিধান করতেন। একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে না গিয়ে জুমুআর সময় ছিল তাই নামাযের জন্য সোজা মসজিদে চলে আসেন। ডেট্রয়েটের মসজিদে একবার আগুন লেগে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি পরম নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে জামাতের সদস্যদের জন্য নিজের ঘর দিয়ে দেন যেন জুমুআর নামায আদায় করা যায়। জামাতের বই-পুস্তক গভীর আগ্রহ এবং উৎসাহের সাথে পড়তেন। তিনি সেই সকল বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের হৃদয়ে সত্যের প্রতি গভীর এক আকর্ষণ ছিল আর এই কারণেই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী গ্রহণ এবং মানার তৌফিক পেয়েছেন। আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বয়আতের অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার স্ত্রীও ইন্তেকাল করেছেন। তার সন্তান-সন্ততিরা কেউই আহমদী নয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মাগফিরাত করুন এবং সকল মরহুমদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)